দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 SEP 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

২৩

দেশ গড়তে শিক্ষা

যে দেশের মানুষ যত বেশী শিক্ষিত সেদেশের জন্মহার ততোধিক নিম্ন, কিন্তু মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন ক্ষমতা উচ্চ এবং এজন্য আয়ও বেশী এবং সেদেশ উন্নত ও সভ্য। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগের মত মানুষ অশিক্ষিত। এ ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রায় সকল নিরক্ষর পরিবারের আকার বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে। অর্থাৎ অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে। অশিক্ষা ও অদক্ষতার কারণে এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পদ না হয়ে নিদারুণ এক সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে এরা যেমন একটি বিরাট বাধাস্বরূপ তেমনি জাতীয় জীবনে পর্বতসম বোঝাও বটে। অর্থাৎ ব্যাপক নিরক্ষরতার কারণে বাংলাদেশে জন্মস্ফীতি, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র, বেকারত্ব, হতাশা, অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি সমস্যার অবাধ চক্রের আবর্তে বিরাজ করছে। এ আবর্তে একটি সমস্যা যেমন একাধিক সমস্যার জন্ম দেয় তেমনি একটির সমাধানও অন্যগুলোর সমাধানের উপর নির্ভরশীল।

পৃথিবীর শিক্ষিত, উন্নত ও সভ্য সমাজ আমাদের গোটা জাতিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। কারণ আমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং অতি মাত্রায় পরনির্ভরশীল। পৃথিবীর শিক্ষিত উন্নত ও সভ্য সমাজে আমাদেরকে সম্মানীয় হিসেবে পরিচিত করতে হলে এখনই আমাদেরকে শিক্ষিত হবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। অশিক্ষিত মানুষগুলোকে আনুষ্ঠানিক ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সভ্য জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে জাতীয় সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা আজ একান্ত অপরিহার্য। চলতি বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদযাপিত শিক্ষা সপ্তাহের মূল শ্লোগান ছিল 'দেশ গড়ার জন্য শিক্ষা', শিক্ষার সাহায্যে পৃথিবীর যেসব দেশ মানব-সম্পদের উন্নয়ন সাধন করে দেশ গড়েছে, উন্নত ও সভ্য হয়ে পৃথিবী জুড়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে—সেসব দেশ থেকেই আমরা এ শ্লোগানটি শিখেছি।

আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের শিক্ষা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ও দুঃখজনক। দেশে পাঁচ ঊর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্বাক্ষরতা ১৯৫১ সালে ১৮.৯% পরবর্তী ১০ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে তা মাত্র ২% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২০.৮%। ১৯৭৪ সালে অর্থাৎ পরবর্তী ১৩ বৎসরে শিক্ষার হার ৩.৪% বেড়ে হয়েছে ২৪.২%, যা আবার ১৯৮১ সালে অর্থাৎ পরবর্তী ৬ বৎসরে ১.৬% কমে ২৩.৮%এ এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থে আমাদের শিক্ষার হার বাড়েনি। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিগত পনের বৎসরে বাংলাদেশে সাক্ষর বা লিখতে পড়তে সমর্থ ব্যক্তির সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৫৮ লাখ। কিন্তু নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি ৯২ লাখ। অর্থাৎ প্রতি নতুন দশজন সাক্ষরের বিপরীতে ৩৩ জন নতুন নিরক্ষর সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ৩৫ বৎসরে বাংলাদেশের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫১ সালে এখানে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬ লক্ষ, ১৯৬৭ সালে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ, ১৯৭৪ সালে ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ, ১৯৮১ সালে ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ এবং ১৯৮৬ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ৬ কোটি ১৮ লক্ষে। বর্তমানে বাংলাদেশে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার ২৩.৭%। এর মধ্যে পুরুষ সাক্ষরের সংখ্যা ৩১% এবং মহিলা ১৬%।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান এ নাজুক ও দুঃখজনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার সচেতন ও সতর্ক। বাংলাদেশে বর্তমানে দুটো পন্থাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে—স্কুলে যাওয়ার বয়সী শিশু শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে উৎসাহিত ও বাধ্য করা এবং বয়স্ক শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দিয়ে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে প্রেরণা সঞ্চার করা। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সঙ্গে সঙ্গে এ স্তরে নিরক্ষরদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে সরকার সচেষ্ট।

বিচার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানে আমরা আমাদের সাক্ষরতার নিম্নহারের কারণ হিসেবে দেখতে পাই যে, দারিদ্রই এর মুখ্য কারণ। এ কারণেই পিতামাতা আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করার জন্য সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে অর্থ উপার্জনে নিয়োজিত করে থাকে। তাছাড়া লেখা পড়ার সামগ্রীর যোগান দেয়াও তাদের পক্ষে কষ্টকর। তাই লেখা পড়ার প্রতি আগ্রহ থাকলেও মূল কারণ দারিদ্র্যের জন্য এক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি।

গত চার দশক ধরে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটিসমূহ তাই আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়াকে রোধ করার লক্ষে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করে আসছে। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের ১৯৮৮ সালের পেশকৃত রিপোর্টেও প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯৫ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক সার্বজনীন করার সুপারিশ করা হয়। কমিটিতে এও সুপারিশ করা হয় যে সম্ভব হলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা. যেসব পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে আছে তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

অত্যন্ত আশার কথা এই যে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসারতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী দেশের সকল ছেলেমেয়েকে এই আইনের অধীনে স্কুলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের জন্য ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শিক্ষা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য দূর করে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের ধারায় একটি কথা প্রচলিত আছে যে ব্যক্তিই যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের রূপকার বা নির্মাতা তখন উন্নয়নের প্রয়োজনে সম্পদ, শ্রম, অর্থ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের আগে ব্যক্তির শিক্ষাগত প্রস্তুতি ও বিকাশকে অবশ্যই প্রধান বলে বিবেচনা করতে হবে। নাগরিক সাধারণকে দক্ষ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কাজ ফেলে রেখে উন্নয়নের কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার অর্থ সময়ের অপচয় ও উদ্যোগের পন্ডশ্রম। অতএব, আর বেশি দেরী নয়, 'আসুন আমরা সবাই মিলে আত্মনিয়োগ করি' দুই হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে।

—রেহানা নবী